৫৯.৩.৫ পুঁথিরচনার উপকরণ ও লিখনরীতি ঃ

পুঁথিনির্মিতির প্রধান উপকরণ তিনটি, প্রথমতঃ যে আধারে পুঁথিটি লেখা হয়, (লেখ্যপত্র), দ্বিতীয়তঃ কালি এবং তৃতীয়তঃ কলম (লেখনী)। দেশে দেশে বিদ্যাচর্চার প্রবহমান ধারার যেমন বিবর্তনের ইতিহাস আছে তেমনি পুঁথিনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রেও দেশকালভেদে ক্রমপরিবর্তনের কাহিনী আছে। স্থানীয়ভাবে যেখানে যে উপকরণ সহজলভ্য এবং কাজে ব্যবহারের উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে সেখানকার পুঁথিনির্মাণের কাজে প্রধানভাবে সেই উপকরণই গৃহীত হয়েছে। প্রাচীন পুঁথির যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তাতে দেখা গেছে গাছের পাতা, কাণ্ড, ছাল, কাঠের পাত, চামড়া, বস্ত্রখণ্ড, ধাতুর পাত এবং সব শেষে হাতে তৈরী কাগজ প্রভৃতিই ছিল পুঁথি লেখার আধার। মিশরের প্যাপাইরাস বা ইউরোপের পার্চমেন্ট একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ভারতবর্ষে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে ভূর্জপত্র, তালপাতা, তেরেটপাতা, তুলোট কাগজ বা হাতে তৈরী কাগজ। সংস্কৃত পুঁথি কাগজে লেখা শুরু হয়েছে কাগজ উদ্ভবের অনেক পরে। কারণ প্রথম দিকে কাগজকে অশুদ্ধ বিবেচনায় পরিহার করা হতো। কাগজের উপাদানের মধ্যে আঠালো ভাতজাতীয় পদার্থের ব্যবহার থাকায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা তাকে পুঁথিলেখার আধাররূপে গ্রহণ করায় দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাছাড়া কাগজ যারা তৈরী করতেন তারা সকলেই যে হিন্দুসমাজের সদস্য ছিলেন এমন নয়। ভূর্জপত্র হিমালয়ের উচ্চভূমিতে সহজলভ্য। তালপাতা এবং তেরেট পাতা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায়। এইসব পাতা সংগ্রহ করার পর তাকে দীর্ঘস্থায়ী এবং লেখার উপযোগী করার জন্য কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হতো। কাগজের উপাদানের মধ্যেও নানারকমের বৈচিত্র্য ছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী উপাদানও সেখানে মিশ্রিত করা হতো। প্রাচীন পুঁথির আধারবস্তু সম্পর্কে যোগিনীতন্ত্রের একটি বক্তব্য হুবহু শ্লোকাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ভূর্জে বা তেজপত্রে বা তালে বা তাড়িপত্রকে।
অগুরুণাপি দেবেশি পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে॥
অন্যবৃক্ষত্বচি দেবি তথা কেতকিপত্রকে॥
মার্তণ্ডপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে।
অন্যপত্রে বা সুদলে লিখিত্বা যঃ সমভ্যসেৎ॥

বারাহীতন্ত্রে পাঁচ রকমের অঙ্কিত লিপির কথা বলা হয়েছে। যথা—

মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনীসম্ভবা।
গুণ্ডিকাঘূণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা মতাঃ॥

তবে পাঠকার্যে ব্যবহারের জন্য প্রথম তিন প্রকার লিপিই প্রযোজ্য। খড়্গমালতন্ত্রে উল্লেখ আছে—

লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতং চ যৎ।
শিল্পাদিনির্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্যে চ সর্বদা॥

পুঁথির আধারের সঙ্গে লিপির বিবর্তনের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। উড়িয়্যাসহ দক্ষিণ ভারতে ব্যবহৃত লিপিগুলির মাত্রা এবং

অক্ষর অনেকাংশে গোলাকৃতি। তাল বা তেরেট পাতায় খুন্তি দিয়ে লেখার জন্য সোজা মাত্রা বা কৌণিক অক্ষর অসুবিধাজনক। এইজন্যই লিপিবিবর্তনের একটি সূত্র তৈরী হয়েছে—"Change of material and change of scripts."

কালি তৈরীর উপাদান ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন লৌকিক ছড়া প্রচলিত আছে। যেমন,

(১) তিল ত্রিফলা শিমুল ছালা। ছাগ দুগ্ধে করি মেলা॥
লৌহ পাত্রে লোহায় ঘষি। ছিঁড়ে পত্র ন ছাড়ি মসী॥

(২) কাজল গোমূত্র লায়ের জল। ভৃঙ্গ ভেলা দিয়া তোল॥ (ভৃঙ্গ = গাছ)
পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি। তোটে পত্র ন তোটে মসি॥

(৩) লোধ লোহা লোহার গুঁড়ি। অর্কাঙ্গার জবার কুঁড়ি॥
গাবের ফল হরিতকী। ভৃঙ্গার্জুন আমলকী।
বাব্‌লা ছাল জাটির রস। ডালিম সেচে করিবে কষ॥
ডেলায় করা এক আলি। চারি যুগ না উঠিবে কালি।

মুড়ি ভাজার জন্য ব্যবহৃত মাটির খোলার গায়ে লেগে থাকা ধোঁয়ার আস্তরণ চেঁচে নিয়ে তা দিয়ে তৈরী হতো 'ভূষো কালি।' তাছাড়া চাল পুড়িয়ে গুঁড়ো করে 'চাল-চুয়ানি' কালি তৈরী হত। উভয় ক্ষেত্রেই আনুষঙ্গিক আরও কিছু উপাদান মেশানো হতো। লক্ষ্য ছিলো কালি যেন সহজে উঠে না যায়। লেখাকে উজ্জ্বল করার জন্য এবং পোকামাকড়ের উপদ্রব আটকানোর জন্য বিবিধ উপকরণের ব্যবহার হতো। লাল-কালি তৈরীর জন্য লাক্ষারস ও হিঙ্গুদ ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

লেখনী হিসাবে স্থানীয় সামগ্রীই ব্যবহৃত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। নলের কাঠি, বাঁশের কঞ্চি, পাখীর পালক ইত্যাদি থেকে সূঁচালো অগ্রভাগ তৈরী করে লেখনী বানানো হতো। ধাতব লেখনীরও ব্যবহার ছিলো বলে মনে হয়। কাঠের ফলকে খোদাই করা অক্ষরে নির্মিত পুঁথিও পাওয়া গেছে (Xylograph)। কলম শব্দটি মূলতঃ আরবিক।

এসব ছাড়াও পংক্তির লেখা সরল করার জন্য, লেখা মুছে ফেলার জন্য, কাগজের বা কলমের ভাব মসৃণ করার জন্য, কলম রাখার জন্য নানারকমের সরঞ্জাম তৈরী ও ব্যবহার করা হতো। শরযন্ত্র নামক বিশেষ আধারে পুঁথি রাখা হতো এবং পুঁথি লেখার জন্য দণ্ডাসন প্রস্তুত করার রীতি ছিল। বিভিন্ন পুরাণে পুঁথিদানের গুরুত্ব এবং মহিমার কথা বলা হয়েছে এবং পুঁথিদানের জন্য বিহিত যজ্ঞক্রিয়ার খুঁটিনাটি বিবৃত করা হয়েছে। সমরাঙ্গনসূত্রে পুঁথিরচনার শিল্পকলা বিবৃত হয়েছে। কালি রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের মসীভাণ্ড বা মস্যাধার ব্যবহৃত হতো। দানের জন্য সোনার কলম এবং রৌপ্যনির্মিত দোয়াতের বিধান আছে। পুঁথির উপরের পাতাটির নাম মলপত্র বা মলপৃষ্ঠ (বর্তমানে মলাট)। পুঁথির পাতাগুলির সোজা পিঠে (recto) কোন পত্রসংখ্যা দেওয়া হতো না, দেওয়া হতো উল্টো পিঠে (verso)। প্রতি পৃষ্ঠার মাঝখানে একটি নির্দিষ্টস্থান ফাঁকা রাখা হতো। ঐখানে ছিদ্র করার পর দড়ি দিয়ে পুঁথিটিকে বাঁধা হতো। তাছাড়াও প্রত্যেক পাতার উপরে নীচে ও দুই পাশে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখা হতো। কোন অংশ লেখার মধ্যে বাদ পরে গেলে পরে ঐসব জায়গায় তা লিখে রাখা হতো এবং ঐ লেখাটির নির্দিষ্ট স্থান সূচনার জন্য চিহ্ন দেওয়া হতো। ঐ চিহ্নের নাম কাকপাদ বা হংসপাদ। গ্রন্থের পরিচায়ক কোন সূচক অক্ষর প্রতি পাতার কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় লেখার রীতিও অনেক পুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। গ্রন্থের পাঠ লেখার সময় অন্য কোন জায়গা খালি রাখা ছিলো রীতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থের মধ্যে সর্বত্র পূর্ণতা বজায় রাখাই ছিলো শাস্ত্রীয় বিধি। ফলে কোন পাতায় একটি অধ্যায় শেষ হলেও ঐ পাতাতেই পরের অধ্যায় শুরু করার রীতি অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর মারাঠী সাধু রামদাস তাঁর বিশাল গ্রন্থ দাসবোধ-এর লেখননিরূপণ-অধ্যায়ে দেবনাগরী লিপির সাহায্যে পুঁথি-রচনা ও পুঁথির সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন।